মাদখালি – তাদের পরিচয় ও পথভ্রষ্টতা

মাদখালি কারা?

আল মাদাখিলা বা মাদখালিরা হল এমন এক ফিরকা যারা নিজেদেরকে সালাফি বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। রাবী’ ইবনে হাদী আল-মাদখালি এর নামানুসারে এই নামকরণ হয়। যেমন আশ’আরীদের “আল-আশা’ইরাহ” নামকরন করা হয় ইমাম আবুল হাসান আশআরী এর নামানুসারে।

“মাদখালি” ছাড়া আরও বিভিন্ন নামেও তাদের ডাকা হয়ে থাকে, যেমন –

জামিইয়্যাহ: আফ্রিকান আলিম মুহাম্মাদ আমান আল-জামি এর নামানুসারে এই নামকরন করা হয়। বস্তুত এই ব্যক্তির মাধ্যমেই উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ফিরকার উদ্ভব হয়। তাদের শুরতে উদ্দেশ্য ছিল জাযিরাতুল আরবে আমেরিকান সেনা মোতায়েনের সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেসব আলিম ও দা’ঈ অবস্থান নিয়েছিলেন (যেমন সাফার আল-হাওয়ালি, সালমান আল-আওদাহ ও সাহওয়াহ আন্দোলনের অন্যান্য আরো অনেকে) যেকোন মূল্যে তাদের বিরোধিতা করা ও তাদের গ্রহনযোগ্যতা নষ্ট করা। তবে মুহাম্মাদ আল-জামি, রাবী’ আল-মাদখালির মত সুপরিচিত নন, এছাড়া তিনি নব্বইয়ের দশকেই মারা যান এবং তার পথভ্রষ্টটা রাবী এর মত এত চরম ছিল না।

সালাফিয়্যাহ জাদীদাহ: নব্য সালাফী/নিও সালাফি

জামাআতুত তাবদী’ ওয়াল হিজরাহ: কারন এই ফিরকার মানহাজ হল অন্যদেরকে বিদআতী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং তাদেরকে বয়কট করা।

আদিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ: সালাফী দাবিদার।

খুলূফ: অর্থাৎ পরবর্তীতে আগত দল... মুসলিম শরীফের এ হাদীস

“তারপর ‘খুলূফ’ এর আগমন ঘটবে, যারা এমন কথা বলবে যা তারা বাস্তবে করবে না, এবং এমন কাজ করবে যা আদেশ করা হয়নি, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যারা নিজ হাত দ্বারা জিহাদ করবে সে একজন মু’মিন হিসাবে চিহ্নিত হবে... ইত্যাদি”। এ হিসাবে এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

সালাফিয়্যুন আহল আল ওয়ালা: সরকারের সাথে ওয়ালা (বন্দুত্ব/মৈত্রী) রাখা সালাফি (সরকারি সালাফি)। মাদখালিদের এক উপদলই সাহওয়াহ আন্দোলনের শাইখদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করতে সউদি আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে এই নাম ব্যবহার করেছিল। পরবর্তী সময় এই গ্রুপের বিরোধিতা করতে এই নামটি কিছু আলিমদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে।

মুরজিয়াতুল আসর: নব্য মুরজিয়া, এ যুগের মুরজিয়া। প্রকৃত ব্যাপার হল ‘ইরজা’ এর দূষিত আদর্শ ব্যাপকভাবে তাদের অনুগামীদের মাঝে প্রচলিত হয়েছে। যদিও এটি তাদের সবচেয়ে প্রধান ও অন্যান্য বৈশিষ্ট না।

তবে এ নামগুলোর মধ্য থেকে আমরা বরং তাদেরকে ‘মাদখালি’ বলে ডাকবো। কারণ পূর্ব-পশ্চিমে যে ব্যক্তি এই দূষণ ছড়িয়েছে সে হল রাবি’ আল মাদখালি। আল্লাহ তাকে তার উচিৎ প্রতিদান দিন। আর সে তাদের আলিমদের মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত।

তাদের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট (তবে তাদের সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য এটি না) হল হিসাবে ‘জারহ’ এবং ‘তাবদী’ সম্পর্কে তাদের ক্ষতিকর চরমপন্থী অবস্থান। কোন হাদীস বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবের কারনে উক্ত বর্ণনাকারী সম্পর্কে দোষ নিরূপন করাকে ‘জারহ’ বলা হয়। যেন কার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে আর কার কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবেনা এটা নির্ধারন করার ক্ষেত্রে এটি হাদীস বিশেষজ্ঞদের জন্য দরকারী একটি শাস্ত্র। পরবর্তী প্রজন্মে কার নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করা হবে আর কার নিকট থেকে করা হবে না, তা নির্ধারনের ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর ‘তাবদী’ হল কোন ব্যক্তিকে বিদ’আতি হিসাবে আখ্যায়িত করা।

জারহ ও তাবদী'র ব্যাপারে তাদের চরমপন্থী অবস্থানের সবচেয়ে প্রকাশ্য উদাহরন হল – "যে বিদ'আতিকে বিদ'আতী বলে ঘোষণা করেনা সে নিজেই বিদ'আতী" – এই নীতির ভুল প্রয়োগ। তারা এই নীতিতে ঠিক ঐভাবে ব্যবহার করে যেভাবে খারেজিরা "যে কাফিরকে কাফির ঘোষণা করেনা সেও কাফির" – এই সঠিক নীতির ভুল প্রয়োগ করে থাকে।

গড়পড়তা এবং সাধারণ মাদখালিদের (সাধারণ মানুষ অথবা আলিম) এই চরমপন্থী চেইন তাবদী' এর শুরু হয় উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ-কে দিয়ে। "যে বিদ'আতীকে বিদ'আতী হিসাবে আখ্যায়িত করবে না সে নিজে বিদ'আতী"। সুতরাং যে সায়্যিদ কুতুব এর 'তাবদী' (তাঁকে বিদ'আতী হিসাবে ঘোষণা করা) থেকে বিরত থাকবে সে নিজে একজন বিদ'আতী। এভাবে তাদের বিদ'আতী আখ্যা দেয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না পৃথিবীতে তাদের দলের কয়েকজন সদস্য ছাড়া বাকি সকলের নামই "বিদ'আতী"-দের খাতায় চলে যায়।

তাদের চরমপন্থার অবস্থা তো এমন যে, তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী আহলুল বিদআহর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, যা হল তাদের এই ফিরকা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আরও অনেক উপদল তৈরি হয়েছে। যেমন কিছু ব্যক্তি কিছু কিছু বিষয়ে রাবি' এর পক্ষাবলম্বনকারী। আবার কিছু ব্যক্তি মিশরের আবুল হাসান আল মা'রিবী এর পক্ষাবলম্বনকারী। বিভক্তির সূচনা হয়েছে যখন আবুল হাসান আল মা'রিবী যখন কিছু ব্যক্তিদেরকে বিদ'আতী আখ্যা দেয়া থেকে বিরত থাকে (এছাড়া আরও কিছু কারন ছিল)। তখন আল-মা'রিবী বিদ'আতি হিসাবে ঘোষিত হয়। যারা আবুল হাসান আল-মা'রিবীকে বিদ'আতী আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকে তাদেরও বিদ'আতি আখ্যা দেওয়া হয়। জর্ডানি মাদখালিরা – যারা নিজেদের শাইখ আলবানীর ছাত্র বলে দাবী করে। তবে এ দাবী মিথ্যা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। শাইখ আলবানীর ঘনিষ্টজনদের মধ্যে আবু মালিক মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্বরাহ এ দাবিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, এ নিজেও একজন প্রক্তন মাদখালি) – এদের অন্তর্ভুক্ত।

মাদখালিদের বিদ'আহ ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হল –

এই বিশ্বাস রাখা যে, মানবরচিত আইন প্রনয়ন, শরীয়াহ দিয়ে শাসন করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা, অথবা শরীয়াহ দিয়ে শাসনের বিরোধিতা বা একে প্রতিহত করা, তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা, এ সবই কেবল ছোট কুফর। তারা মনে করে যে এসব কাজ শুধুই ছোট কুফর আর এসব কাজ কাউকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় না, ইস্তিহলাল ব্যতীত। ইস্তেহলাল হচ্ছে কোন গুনাহকে হালাল মনে করা। সুতরাং তারা ইস্তিহলাল এর শর্তারোপ করে কুফর আকবর ও শিরকে আকবরকে ছোট কুফর এবং চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদির মত গুনাহ এর সমতুল্য সাব্যস্ত করে।

কোন ব্যক্তিকে মুসলিম হিসাবে ফায়সালা দেয়ার জন্য আ'মাল বিল আরকান তথা 'কাজে পরিণত করা' এটা ঈমানের অংশ বা শর্ত কোনটাই নয়। সুতরাং তাদের মতে কোন ব্যক্তি যদি কখনো সালাত আদায় না করে, কখনো যাকাত আদায় না করে, কখনো সিয়াম পালন না করে, হজ্ব না করে, কখনো ওযু করে না, কখনো তাহারাত অর্জন না করে ইত্যাদি, তারপরও সে মুসলিম হিসাবে সাব্যস্ত হবে। এবং শেষপর্যন্ত তার ইসলাম নাকি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবে। এমন ব্যক্তিকে তারা শুধুমাত্র একজন গুনাহগার হিসাবে আখ্যায়িত করবে। কাফির নয়। সুতরাং তারা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুরজিয়াদের অনুসরণ করেছে।উল্লেখ্য যে তাদের অনেকে তাত্ত্বিক আলোচনার সময় এসব বিষয় অস্বীকার করে এবং আহলুস সুন্নাহর কথা নকল করে। কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের এই জঘন্য আকিদা অনুযায়ী-ই সিদ্ধান্ত দেয়। অর্থাৎ তাদের মুখের কথা বা রচনাবলীতে তারা নিজেদের আহলুস সুন্নাহ হিসাবে উপস্থাপন করে কিন্তু তাদের কাজ প্রমান করে যে তারা মুরজিয়াদের মাযহাবের উপরে আছে।

পার্থিব জীবনের নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিষয়ে উজর বিল জাহল বা অজ্ঞতার অজুহাতের অতিরঞ্জিত ব্যবহার। কাজেই যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, সর্বাবস্থায়, সকল প্রেক্ষাপটে তারা তাকে মুসলিম সাব্যস্ত করে থাকে। সুতরাং

তাদের কাছে উসুলুদ্দিন, জুরুরিয়াতে দ্বীন, আর খাফি অর্থাৎ যেসব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট – সেগুলোর কোন পার্থক্য নেই। দ্বিনের মৌলিক ভিত্তি, দ্বীনের যেসব বিষয় জানা আবশ্যিক আর যেসব বিষয় সুক্ষ ও অপেক্ষাকৃত অপষ্ট – সবকিছুই তাদের কাছে সমান। সবকিছুর ব্যাপারে হুকুম একই। মাদখালিদের মতে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বড় হয়েছে আর যে হয়নি – তাদের দুইজনের ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা একইরকম আর অজ্ঞতার অজুহাত একইরুম। অজ্ঞতার অজুহাত দেওয়ার ক্ষেত্রে দুইজনেই তাদের কাছে সমান। একজন নও মুসলিম আর যে নও মুসলিম না – এই দুইজনের ক্ষেত্রেও তাদের মতে অজ্ঞতার মাত্রা ও অজুহাতের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। যদি এরা বিভিন্ন স্পষ্ট কুফর ও শিরক আকবরে পতিত হয় তাহলেও সর্বাবস্থায় মাদখালিদের মতে এরা মুসলিম, কারন "অজ্ঞতার অজুহাতের সম্ভাবনা"! তাদের এই বিভ্রান্তি তাউয়িলের (ভুল ব্যাখ্যা) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর এই তাউয়িলের অজুহাত দিয়ে তারা এমন অনেক শাসকের জন্য অজুহাত দাড় করায় যারা নিজেদের মানবরচিত আইন রচনার ক্ষেত্রে ইস্তিহলালের কথা সরাসরি মুখে ঘোষণা করেছে অথবা সেকুলারিজমের মতো সুস্পষ্ট ও নির্ভেজাল কুফরের কথা বলে শরীয়াহ দ্বারা শাসনকে অস্বীকার করেছে।

কাফিরদের সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওয়ালা (মৈত্রী/বন্ধুত্ব) –কে তারা কুফর আকবর মনে করে না, যদি না সে ব্যক্তি কুফরকে অন্তরীণ করে। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি কুফরের ধর্মকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক অথবা আল্লাহর দ্বীনকে নির্মূল করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে মাদখালিদের মতে কুফফারের সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওয়ালা কুফর আকবর না। সুতরাং কেউ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেতৃত্ব দেয়, সম্পদ এবং রক্ত দ্বারা এতে সমর্থন-সহযোগিতা করে – তারপরও সে মুসলিম হিসাবেই থেকে যাবে! যতক্ষন পর্যন্ত না সে ব্যক্তি মুখে তার অন্তরের কুফরের ইচ্ছা অন্তরীন থাকার কথা ঘোষণা করবে না ততোক্ষণ এসবকিছু করার পরও এ লোককে মুসলিম গণ্য করা হবে! সুতরাং তাদের এই নবউদ্ভাবিত শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়া তারা আসলে এই কাজগুলোকে কুফর মনে করে না।

তারা বিশ্বাস করে যে জিহাদ কখনোই সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর ফরযে আইন হতে পারেনা। এছাড়াও জিহাদের ব্যাপারে তারা আরো বিশ্বাস করে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও এই রাষ্ট্রের ইমামের অনুমতি ছাড়া কোন ধরনের জিহাদ জায়েজ নেই। ইমামের নির্দেশ ছাড়া তারা জিহাদকে নিষিদ্ধ মনে করে। এবং এসবই তারা রক্ষণাত্মক জিহাদের ব্যাপারে মনে করে।

মুরতাদ শাসক ও তাদের সেনাদের যারা তাকফির করে তাদেরকে মাদখালিরা 'খারেজি' বা 'তাকফিরি' আখ্যায়িত করে। এ সকল মুরতাদ শাসকদের আনুগত্য ত্যাগ করা, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে মাদখালিরা নিষিদ্ধ মনে করে, এবং এতে বাঁধা দেয় – কারন তারা এসব শাসকদের মুসলিম শাসক মনে করে। এমনকি যদি তারা ইছু কিছু শাসককে কাফিরও মনে করে, তবুও তারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে অবৈধ মনে করে, একারনে যে, এটি কোন ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান এর নেতৃত্বে হচ্ছে না।

চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতনতা বা ফিকহুল ওয়াকির গুরুত্ব হালকা করে ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। বলে এগুলো শুধুমাত্র শাসক ও আলিমদের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য এগুলো জানার প্রয়োজন নেই। এই নির্বোধ ধারণার কারনেই অনেক সাধারণ মুসলিমকে তাদের ভূখন্ডের শাসককে মুসলিম শাসক বলে মনে করে। কারন এই শাসকদের কুফর সম্পর্কে তারা বেখবর থাকে। যার ফলে এই সাধারন জনগণের অনেকে এই মুরতাদ শাসকদের একনিষ্ঠ গোলাম ও কর্মচারী হয়ে তাদের রাহে নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়

তারা যাদেরকে বিদ'আতি আখ্যায়িত করেছে এমন সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে মানুষের অবস্থান পরীক্ষা করা। যদি কোন ব্যক্তি তাদের এ ধরনের তাবদী' এর সাথে একমত পোষণ করে তবে সে তাদের বন্ধু হয়ে যায়, আর যদি একমত পোষণ না করে তবে সে ব্যক্তি তাদের এক শত্রু হিসাবে চিত্রিত হয়, এবং তার উপর আক্রমন শুরু হয়ে যায়। তারা বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিদ'আতি আখ্যায়িত করে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারনার উপর ভিত্তি করে। যেমন – শাইখ আব্দুল্লাহ

আযযাম রহ. বলেছেন জিহাদ ফরযে আইন। মাদখালিদের মতে এটা বিদ'আত। সুতরাং তিনি (শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.) বিদ'আতী। মসজিদে কোন লোক বক্তব্য দিচ্ছে, তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে "আব্দুল্লাহ আযযাম সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?" যদি সে বলে, উনি একজন ভালো মানুষ – তাহলে তারা এই ব্যক্তিকে এখন বিদআতি বলা শুরু করবে অথবা তাকে সন্দেহভাজনদের তালিকাভুক্ত করে রাখবে।

সরকার ও রাজনীতির প্রশ্নে তারা অন্ধভাবে সরকারের নিয়োজিত আলিমদের অনুসরণ করে। কাজেই যদি সরকারের কর্মচারী কোন আলিম ফিলিস্তীনে ইয়াহুদিদের সাথে শান্তির কথা বলে, তাহলে মাদখালিরাও তোতাপাখির মত সেটা আউড়িয়ে যায়। যেমন – শাইখ ইবনে বাজ অথবা শাইখ ইবনে উসাইমিন মাদখালি নন, যদিও এটা হলেও হতে পারে যে মাদখালিদের কিছু মূলনীতিগুলোর কিছু শাখা-প্রশাখা তাদের মধ্যে থেকে থাকতে পারে। মাদখালিরা অন্ধভাবে রাজনীতি ও সরকারের ব্যাপারে এই শাইখদের মতামত যেহেতু তারা সরকার নিযুক্ত আলিম ছিলেন।

অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে এরা আলিম ও সঠিক "মানহাজের উপর" থাকা বলে মনে করে। এই অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কাউকে এই মানহাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যাবে না। এই মানহাজ এর কবিরাজদের মধ্যে আছে রাবী' আল-মাদখালি, উবাইদ আল জাবিরী প্রমুখ। 'জারহ' এবং তাবদী' এর ব্যাপারে মাদখালিরা অন্ধভাবে এদের অনুসরণ করে থাকে।

মাদখালিদের স্বাভাবিক প্রবণতা হল আলে-সৌদ শাসকগোষ্ঠীকে যেকোন মূল্যে সমর্থন করা। এটাকে তারা পবিত্র দায়িত্ব মনে করে। তবে অধিকাংশ তাগুত শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপারে তাদের অবস্থান হল আনুগত্য ও সক্রিয় সমর্থনের। তবে তাদের কেউ কেউ সিরিয়া, লিবিয়া (গাদ্দাফি) এর শাসকগোষ্ঠীর উপর তাকফির করে। কিন্তু সর্বদা, সর্বাবস্থায় জানপ্রান দিয়ে সৌদি শাসকগোষ্ঠীর প্রশংসা, সমর্থন ও বৈধতা দেয়ার ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে বলা যায় ইজমা আছে।

যেসব কাজ আদৌ বিদআত না, বরং দ্বীন ইসলামের সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো নিয়েও তারা খুব দ্রুত ও অবলীলায় মানুষকে বিদাআতী বলে ঘোষনা করে। যেমন জিহাদ। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন কিছুতে পতিত হয় যা আসলেই বিদআত, তাহলে তারা পুরোপুরিভাবে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করা এবং তার লিখিত রচনাবলী পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যেমন উস্তাদ সাইদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ কিছু বিষয়ে বিদআতে পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ একই কথা অতীত ও বর্তমানের অনেক আলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের কথা আহলুস সুন্নাহও উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করে আবার মাদখালিরাও করে। যেমন – ইবনে হাযম, ইমাম নববী, ইবনে হাজর প্রমুখ। অথচ সাইদ কুতুব বা তাঁর মতো অন্যান্যদের বেলায় তারা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের বই পড়াকে নিষিদ্ধ বলে থাকে।

যেহেতু মুরতাদ শাসকদের অনেককেই মাদখালিরা শরয়ীভাবে বৈধ মুসলিম শাসক আর এই শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের খারেজি মনে করে। তাই এসব শাসকদের সাথে মৈত্রী ও বন্ধুত্বকে তারা বৈধতা দেয় এবং একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীকে সহায়তা করা এরা জায়েজ এমনকি উত্তম কাজ মনে করে। আর এটি হল মাদখালিদের সবচেয়ে বিপদজনক বৈশিষ্ট্য। কারন এর মাধ্যমে তারা মুসলিম বিরুদ্ধে মুরতাদদের সহায়তা করে, গুপ্তচরবৃত্তি করে এবং মুসলিমদের মুরতাদ শাসকদের বাহিনীগুলোর হাতে ধরিয়ে দেয়। আর কার্যত এটি মুদ্বাহারা অর্থাৎ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহায়তা করা।

মাদখালিরা শেষ পর্যন্ত এমন সব অবস্থান গ্রহন করে যা ইসলামের শত্রুদের উপকারে আসে আর উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর হয়, যা খারেজিদের কার্যকলাপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারন খারেজিরা আহলে ইসলামকে হত্যা করে আর মুশরিকদের ছেড়ে দেয়।